بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ৩১ সুলাহ্, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত শুক্রবার 'যী কারাদ'-এর যুদ্ধ (সম্পর্কে) আলোচনা হচ্ছিল। যেমনটি বলেছিলাম, মহানবী (সা.) এই যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কয়েকজন সাহাবীকে শত্রুদল অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) তাদের অনুসরণে স্বীয় সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। এ প্রসঙ্গে আরো লেখা আছে, মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা যখন আগমন করেন তখন তাদেরকে দেখে শত্রুসেনারা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা শত্রু-শিবিরে পৌঁছলে সেখানে হযরত আবু কাতাদা (রা.)-র ঘোড়াটি দেখতে পান, যেটির পায়ের রগ কাটা ছিল। একজন সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু কাতাদার ঘোড়ার পায়ের রগ তো কেটে ফেলা হয়েছে! মহানবী (সা.) সেটির পাশে দাঁড়িয়ে দুবার বলেন, **'তোমার মঙ্গল হোক! যুদ্ধে তোমার শত্রুর কোনো অভাব নাই।'** এরপর মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে পৌঁছেন যেখানে হযরত আবু কাতাদা (রা.) এবং মাসআদা মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। (গত শুক্রবার এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল)। তারা মনে করেন, হযরত আবু কাতাদা (রা.) চাদরাবৃত হয়ে পড়ে আছেন। একজন সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আবু কাতাদা শহীদ হয়ে গেছেন! মহানবী (সা.) বলেন, **'আল্লাহ্ আবু কাতাদার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। সেই সত্তার কসম যিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন! আবু কাতাদা তো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং রণসঙ্গীত গাইছে।'**

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাফেলা বা সেনাদল যখন আমার ঘোড়াকে পায়ের রগ কাটা অবস্থায় দেখতে পায় এবং নিহত ব্যক্তিকে আমার চাদরে আবৃত অবস্থায় দেখতে পায়– তখন তারা মনে করেন, সম্ভবত আমি শহীদ হয়ে গিয়েছি। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চাদর সরালে মাসআদার চেহারা দেখতে পান। তারা উভয়ে বলেন, আল্লাহু আকবর! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ-তো মাসআদা। তখন সাহাবীরাও তাকবীর বলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই হযরত আবু কাতাদা (রা.) উটের পাল হাঁকিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, **'হে আবু কাতাদা! তুমি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছ। আবু কাতাদা অশ্বারোহীদের সর্দার। হে আবু কাতাদা! আল্লাহ্ তোমার মাঝে কল্যাণ সৃষ্টি করুন।'** অপর রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, **'তোমার সন্তানসন্ততিকে প্রজন্ম পরম্পরায় কল্যাণমণ্ডিত করুন।'** এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু কাতাদা! তোমার চেহারায় কী হয়েছে? হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আমার (এখানে) একটি তির লেগেছিল। সেই সত্তার কসম যিনি আপানাকে সম্মানিত করেছেন! আমার ধারণা ছিল, আমি তিরটি বের করে ফেলেছি। মহানবী (সা.) বলেন, আবু কাতাদা! আমার কাছে আসো। আমি মহানবী (সা.)-এর নিকটে যাই। তিনি (সা.) পরম যত্নে তিরটি বের করে নিজের মুখের লালা (সেখানে)

লাগিয়ে দেন এবং নিজের হাত সেটির ওপর রাখেন। হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি তাঁকে (সা.) নবুয়্যত দান করেছেন! আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার কোনো আঘাতই লাগে নি আর ক্ষতও হয় নি। [গতবার উল্লেখ করা হয়েছিল, হযরত আবু কাতাদা (রা.) নিজেই তির (টেনে) বের করেছিলেন, তবে হতে পারে সেটির কোনো অংশ বা ফলা ভেতরে রয়ে গিয়েছিল যা তিনি (সা.) বের করেন। সেটির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল।] আরেক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-কে দেখে বলেন, **'হে আল্লাহ্! তার কেশগুচ্ছ ও ত্বকে কল্যাণ দান করো।'** আরো বলেন, **তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে** অর্থাৎ তুমি সফল হয়েছ। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে অর্থাৎ আপনি সফল হয়েছেন। এরপর যখন সত্তর বয়স বছরে হযরত আবু কাতাদা (রা.) ইন্তেকাল করেন তখন তার চেহারা দেখে মনে হতো যেন তার বয়স পনেরো বছর, অর্থাৎ তার চেহারা যুবকের মতো লাগত।

এই যুদ্ধে হযরত সালামা (রা.)-র **যী কারাদ**-এ শত্রুর সাথে লড়াইয়ের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়: হযরত সালামা (রা.) বলেন, আমি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে ছুটছিলাম, এমনকি সেই সত্তার কসম যিনি মহানবী (সা.)-কে সম্মানিত করেছেন! (এক পর্যায়ে) আমি আমার পেছনে কোনো সাহাবীকে দেখতে পাচ্ছিলাম না আর তাদের (ছুটে আসার) উড়ন্ত ধূলিকণাও দেখা যাচ্ছিল না। শত্রুরা সূর্যাস্তের পূর্বেই একটি ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়, যেখানে **যী কারাদ** নামক একটি ঝরনা ছিল। তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চায়। যখন তারা দেখে, আমি তাদের পেছনেই রয়েছি, তখন তারা সেখান থেকে সরে যায়। সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি এক ব্যক্তিকে দেখে তির নিক্ষেপ করি, সকালেও আমি তাকে (উদ্দেশ্য করে) তির নিক্ষেপ করেছিলাম; এখন দ্বিতীয় তির নিক্ষেপ করি আর দুটি তিরই তার (শরীরে) বিদ্ধ হয়। সে দুটি ঘোড়া ফেলে পালিয়ে যায়, তখন আমি সেই দুটিকে আটক করি; ইতঃমধ্যে মহানবী (সা.) পৌঁছে গিয়েছিলেন তাই সেগুলোকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাঁকিয়ে নিয়ে আসি।

মহানবী (সা.)-এর **যী কারাদ** পৌঁছানো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সালামা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এশার সময় পৌঁছেন এবং ঝরনার কাছে শিবির স্থাপন করেন, যেখানে আমি শত্রুদের প্রতিহত করেছিলাম। তিনি (সা.) সবগুলো উট এবং শত্রুদের কাছ থেকে যা আমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম– সবকিছু নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উট জবাই করেন যা শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য এর কলিজা ও কুঁজের মাংস ভুনা করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খেজুর বোঝাইকৃত দশটি উট প্রেরণ করেন যা তিনি (সা.) **যী কারাদ** নামক স্থানে প্রাপ্ত হন। হযরত সালামা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, আমি শত্রুদের পানি নিতে বাধা দিয়েছিলাম তাই তারা তৃষ্ণার্ত ছিল। আপনি যদি আমাকে একশ মুজাহিদসহ প্রেরণ করেন তাহলে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের সকল গুপ্তচরকে হত্যা করব। তিনি (সা.) হাসতে থাকেন, এমনকি আগুনের আলোয় তাঁর পবিত্র দাঁত দৃশ্যমান হচ্ছিল। তিনি (সা.) বলেন, সালামা! তুমি কি (সত্যিই) এমনটি করতে পারবে? আমি নিবেদন করি, যিনি আপনাকে সম্মান দিয়েছেন সেই সত্তার কসম! অবশ্যই পারব। তিনি (সা.) বলেন, ملكت فاسجح তুমি যদি তাদেরকে কাবু করতে পারো তাহলে (তাদের প্রতি) কোমল ব্যবহার কোরো। এটি আরবের প্রবাদের মধ্য হতে একটি প্রবাদ, যার অর্থ হলো– সর্বোত্তম ক্ষমা

হলো, নম্রতা প্রদর্শন করো এবং কঠোরতা পরিহার করো। তারা যদি চলে যায় তাহলে চলে যাক, এখন আর তাদের পিছু নেবার প্রয়োজন নেই।

এই যুদ্ধে ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সালামা (রা.) বলেন, প্রত্যুষে মহানবী (সা.) বলেন, **'আজকের সর্বোত্তম অশ্বারোহী আবু কাতাদা এবং সর্বোত্তম পদাতিক সালামা বিন আকওয়া।'** হযরত সালামা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) আমাকে আরোহী ও পদাতিক উভয় হিসাবেই (গনিমতের) অংশ প্রদান করেন, এরপর আমাকে তাঁর উটনীতে নিজের পেছনে আরোহণ করান। এই সফরে হযরত সালামা (রা.)-র আরো একটি ঘটনা বা রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সালামা (রা.) বলেন, মদীনায় ফেরত আসার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছি তখন একজন আনসারী সাহাবী যিনি অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারতেন, ঘোষণা দিয়ে বলেন, কেউ কি আছে যে আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে চায়? অর্থাৎ পবিত্র মদীনা পর্যন্ত আমার সাথে দৌড়ে যাবে? তিনি কয়েকবার এই বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর উটের ওপরে তাঁর পেছনেই আরোহিত ছিলাম। আমি সেই আনসারী সাহাবীকে বলি, তুমি কি কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করবে না? তোমার কি কোনো ভদ্রলোকের (সম্মানের) ভয় নেই যে, এই ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছো? তিনি বলেন, না, মহানবী (সা.) ব্যতিরেকে আমি আর কাউকে ভয় করি না। তখন আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি নিবেদিত। আপনি আমাকে এই ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতার অনুমতি দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, তুমি যদি চাও তাহলে প্রতিযোগিতা করতে পারো। আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, তাহলে চলো। এরপর তিনি বলেন, আমি আমার পা ভাঁজ করে লাফ দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করি আর আমি একটি বা দুটি উপত্যকা পর্যন্ত দৌড়ে তার পেছনে ছিলাম। অর্থাৎ সে সামনে আর আমি পেছনে ছিলাম। আর তখন আমি আমার শক্তি সঞ্চয় করছিলাম। এরপর আমি আমার গতি বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলি আর তার দুকাঁধের মাঝে চাপড় দিয়ে বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছি। তিনি মুচকি হেসে বলেন, আমারও তা-ই মনে হয়। আর এভাবে আমি এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সামনে এগিয়ে যাই, এমনকি আমরা মদীনায় পৌঁছে যাই।

এই যুদ্ধাভিযানের জন্য মহানবী (সা.) কতদিন মদীনার বাহিরে ছিলেন এর বিশদ বিবরণে লেখা হয়েছে, মহানবী (সা.) বুধবার সকালে যাত্রা করেন এবং তিনি (সা.) এক রাত এক দিন যী কারাদ-এ অবস্থান করেন যেন শত্রুদের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়। এরপর তিনি (সা.) সোমবার মদীনায় ফিরে আসেন। আর এভাবে তিনি (সা.) পাঁচ রাত মদীনার বাহিরে অবস্থান করেন। এই যুদ্ধে যেসব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাদের বিবরণ হলো, মুসলমানদের মধ্যে হযরত মুহরেয বিন নাযলা শহীদ হন। ইবনে হিশামের মতে ইবনে ওয়াক্কাস বিন মুজায্‌যেয-ও শহীদ হয়েছিলেন। তারা ছাড়া হযরত আবু যার (রা.)-র পুত্রকে যুদ্ধের পূর্বেই উটের বাথানে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কাফিরদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে, কাফিরদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন উয়ায়না, হুবায়েব বিন উয়ায়না, মাসআদা বিন হাকামা ফাযারী, ওবার এবং তার পুত্র আমর নিহত হয়।

হযরত আবু যার (রা.)-র স্ত্রীকে শত্রুরা বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছিল। আক্রমণকারীরা হযরত আবু যার (রা.)-র স্ত্রীকে আটক করে নিজেদের সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল আর তারা তাকে বেঁধে রেখেছিল। রাতের বেলা তারা গবাদি পশুপাল নিজেদের ঘরের সামনে রাখত। এক রাতে সেই মহিলা তার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং

কাছেই বেঁধে রাখা উটগুলোর কাছে যান। যখনই তিনি কোনো উটের কাছে যেতেন তখন সেটি শব্দ করত। অর্থাৎ সেটি চিৎকার করত আর তিনি সেটিকে ছেড়ে দিতেন। এমনকি তিনি যখন আযবা-র কাছে পৌঁছেন; [এটি মহানবী (সা.)-এর সেই উটনী যেটিকে শত্রুরা ছিনতাই করে সাথে নিয়ে এসেছিল;] সেটির কাছে যখন পৌঁছেন তখন সেটি কোনো শব্দ করে নি বা কোনো চিৎকারও করে নি, একেবারেই শান্ত ছিল। সেটি প্রশিক্ষিত উটনী ছিল। সেই মহিলা সেটির পিঠে আরোহণ করেন এবং সেটিকে পা দিয়ে আঘাত করতেই সেটি ছুটতে আরম্ভ করে। শত্রুরা তার পালিয়ে যাবার বিষয়টি অবগত হলে তারা তাকে আটক করতে চায়, কিন্তু তিনি তাদের হাতে ধরা পড়েন নি। বর্ণনাকারী বলেন, সেই মহিলা আল্লাহ্‌র সমীপে একটি মানত করেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি তাকে এই উটনীর মাধ্যমে মুক্তি দেন তাহলে তিনি অবশ্যই সেটিকে জবাই করে দেবেন। যখন সে মদীনায় আসে আর মানুষজন তাকে দেখে তখন তারা বলে, এতো মহানবী (সা.)-এর উটনী আযবা। সেই মহিলা বলে, আমি তো মানত করেছি, যদি আল্লাহ্ আমাকে এই উটনীর মাধ্যমে উদ্ধার করেন তাহলে আমি এটি কুরবানী করে দেবো। এই বাগ্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁর কাছে এসব কথা (সবিস্তারে) বর্ণনা করে। মহানবী (সা.) বলেন, সুবহানাল্লাহ্, এই মহিলা এই উটনীকে কত মন্দ প্রতিদান দিয়েছে! [এটি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, অথচ সে তাকে এই প্রতিদান দিচ্ছে!] এই মানত করার মাধ্যমে (মন্দ প্রতিদান দিচ্ছে) যে, আল্লাহ্ যদি তাকে এই উটনীর মাধ্যমে উদ্ধার করেন তাহলে তিনি এটিকে জবাই করবেন– এটি কোনো উত্তম প্রতিদান নয়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পরিপন্থি কোনো মানত যেন পূর্ণ না করা হয়, আর সেই (জিনিস) মানত করাও বৈধ নয় যার মালিকানা বান্দার নেই। অর্থাৎ তুমি তো এর মালিকও নও। তিনি (সা.) বলেন, এটি আমার উটনী, (তাই) তুমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ভালোয় ভালোয় নিজের বাড়ি ফিরে যাও।

এখন একটি সেনাভিযানের উল্লেখ করব। এটিকে নাজদ অভিমুখে হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-র সেনাভিযান বলা হয়। এই সেনাভিযান সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। যদিও আরেক রেওয়ায়েতে এই সেনাভিযানের সময়কাল সপ্তম হিজরীর জমাদিউস সানী বলা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এই সেনাভিযান সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এই সেনাভিযানের সময়কাল সপ্তম হিজরীর মহররম (মাস) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, খায়বার অভিমুখে যাত্রা শুরু করার পূর্বে মদীনা থেকে নাজদ অভিমুখে হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-কে প্রেরণ করা হয়। আর খায়বার অভিমুখে যাত্রা হয়েছিল সপ্তম হিজরীর মহররমে।

হযরত আবান (রা.)-র পরিচয় হলো, তার পিতা জ্যেষ্ঠ কুরাইশের একজন ছিলেন। তার ভাই আমর এবং খালেদ পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবান (রা.) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উসমান (রা.)-কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমর এবং খালেদ ইথিওপিয়া থেকে ফেরত এসে আবান (রা.)-কে ডেকে পাঠান। এমনকি তারা তিনজন একত্রে খায়বারের দিনগুলিতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং আবান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.) হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খায়বারের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী

(সা.)-এর তিরোধানের সময় আবান (রা.) বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে আসেন এবং তারপর সিরিয়ায় চলে যান আর তেরো হিজরীতে তিনি শহীদ হন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি ২৭ হিজরীতে হযরত উসমান (রা.)-র খিলাফতকালে মৃত্যু বরণ করেন। খায়বারের যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-র নেতৃত্বে নাজদ অভিমুখে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। নাজদ একটি শুষ্ক মরু অঞ্চল হলেও উর্বর ভূমি ছিল, যেখানে বহু উপত্যকা ও পর্বতমালা রয়েছে। এটি দক্ষিণে ইয়েমেন আর উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পশ্চিমে হিজায মরুভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারোশ মিটার উঁচু আর এই উচ্চতার কারণেই এটিকে নাজদ বলা হয়। এই সৈন্যদলের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.)-এর অনুপস্থিতিতে মদীনাকে বিভিন্ন শত্রু গোত্র থেকে নিরাপদ রাখা। এই গোত্রগুলো সর্বদা এই সুযোগ খুঁজতে থাকত যে, কখন মোক্ষম সুযোগ পাওয়া যাবে আর মদীনায় আক্রমণ করবে। সাহাবীদেরসহ মহানবী (সা.)-এর মদীনার বাহিরে যাওয়াকে মদীনায় আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ মনে করত। শত্রুরা মনে করত, এখন মহানবী (সা.) মদীনার বাহিরে আছেন আর মানুষও তাঁর সাথে আছে; সেনাদল সাথে রয়েছে, মদীনায় অনেক কম মানুষ রয়েছে; তাই আমরা আক্রমণ করে মদীনা দখল করতে পারব। এই আশঙ্কার কারণে মহানবী (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধে যেতেন তখন এমন সব (শত্রু) গোত্রের অভিমুখেও কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতেন। এই সেনাভিযানের উল্লেখ সহীহ্ বুখারীতে এভাবে রয়েছে: মহানবী (সা.) হযরত আবান (রা.)-কে একটি সেনাভিযানে (আমীর) মনোনীত করে মদীনা থেকে নাজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এরপর আবান (রা.) এবং তার সঙ্গীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে খায়বারে আসেন, ততক্ষণে তিনি (সা.) খায়বার বিজয় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরা যেহেতু খায়বার বিজয়ের পরে এসেছে তাই এদেরকে (গনিমতের) অংশ দেবেন না। অর্থাৎ খায়বারের গনিমতের সম্পদ থেকে তাদের কোনো অংশ পাওয়া উচিত নয়। যার ফলে তাদের দুইজনের মধ্যে পারস্পরিক তর্ক হয়। মহানবী (সা.) বলেন, হে আবান! বসে পড়ো। আর তিনি (সা.) তাকে অংশ দেন নি, কেননা তিনি সরাসরি খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন নি, সম্ভবত এটাই কারণ।

এরপর ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত একটি যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটিকে খায়বারের যুদ্ধ বলা হয়। খায়বার একটি বিস্তৃত শস্যশ্যামল উপত্যকা যা বিভিন্ন ঝরনা ও প্রচুর পানির উপস্থিতির কারণে সবুজ-শ্যামল আর আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বড়ো খেজুরের বাগানের জন্য বিখ্যাত। এর উর্বরতার অনুমান এর মাধ্যমেও করা যায় যে, খায়বারের শুধুমাত্র একটি উপত্যকা, যেটি **কাতিবা** নামে পরিচিতি, সেখানে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ ছিল। খায়বার উপত্যকাটি মদীনার উত্তরদিকে আনুমানিক ৯৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীদের বসতি ছিল। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে এখানে বনী ইসরাঈলের ইহুদীদের বসবাস ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বুখতনসর (তথা নেবুচ্যাডনেজার)-এর যুগে ইহুদীরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আরো কিছু বিবরণ রয়েছে। সবকিছুর মূল কথা হলো, খায়বারে প্রাচীন কাল থেকেই ইহুদীদের বসবাস ছিল। আর বড়ো বড়ো দুর্গ নির্মাণ করে এরা এখানে বাস করত। তাদের দৃষ্টিতে এ জায়গার অনেক গুরুত্ব ছিল এবং বলা হয়, এখনো আছে। হিব্রু ভাষায় খায়বার শব্দের অর্থ দুর্গ। ইহুদীদের কিছু গোত্র মদীনাতেও বসবাস করত, কিন্তু

খায়বারের ইহুদীরা যে-কারণে ব্যতিক্রম ছিল তা হলো, এখানকার ইহুদীরা অন্য সকল ইহুদীর চেয়ে সাহসিকতা এবং রণক্ষেত্রে অবিচলতা প্রদর্শনে দক্ষ ছিল আর তাদের পারস্পরিক ঐক্যও অন্যদের তুলনায় অধিক ছিল, যে-কারণে এরা আরব ভূখণ্ডে দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হতো। মদীনার ইহুদী হোক কিংবা খায়বারের ইহুদী– মহানবী (সা.) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। বিদ্বেষ ও শত্রুতায় ক্রমবর্ধমান এই জাতি ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করতে কিছু আর বাকি রাখে নি। অথচ এর বিপরীতে মহানবী (সা.) মদীনার ইহুদীদের সাথে সর্বদা কোমল ব্যবহার করেছেন। তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছেন এবং তারা যখনই চুক্তিভঙ্গ করত কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করত তখন মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করার চেষ্টাই করতেন। এমনকি তারা অসংখ্যবার মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার চেষ্টাও করেছিল। চুক্তিভঙ্গ করে বহিঃশক্তিকে মদীনায় আক্রমণ করতে সাহায্য করেছে, যার বিচারে শাস্তিস্বরূপ সকল ইহুদীকে যদি চরম কঠিন শাস্তিও প্রদান করা হতো তবে তা একেবারেই ন্যায়বিচার বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর অনুপম ক্ষমা ও অনুগ্রহের মান এমন ছিল যে, এতকিছুর পরও তাদের জান-মালের এমন নিরাপত্তা বিধান করেছেন যে, কেবল মদীনা থেকে নির্বাসিত করে বলেছেন, সাথে করে যা কিছু নিয়ে যেতে চাও নিতে পারো। মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য যদি (নাঊযুবিল্লাহ্) বলপ্রয়োগ হতো তাহলে মদীনার ইহুদীদের বার বার চুক্তিভঙ্গের কারণে তাদেরকে কখনো ক্ষমা করতেন না। মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য যদি রক্তপাত করা হতো তাহলে বনু কায়নুকা এবং বনু নযীরকে কখনো প্রাণের নিরাপত্তা প্রদান করে মদীনা থেকে নিরাপদে চলে যেতে দিতেন না। মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য যদি ধনসম্পদ অর্জন করা হতো তাহলে বনু নযীর, যাদেরকে আরব উপদ্বীপে সবচেয়ে সম্পদশালী গোষ্ঠী মনে করা হতো, কখনো মশক ও বড়ো বড়ো থলে ভরতি করে সোনা-রূপা মদীনাবাসীর সামনে তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। আর যে সদাচার, অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ ব্যবহার মহানবী (সা.) মদীনার সেসব ইহুদীর সাথে করেছিলেন, এতে খায়বারে বসতি স্থাপনের পর এসব লোকের উচিত ছিল ইসলাম ও এর প্রতিষ্ঠাতার অনুকূলে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপত্তার পরিবেশে বসবাস করা। মদীনা থেকে নির্বাসিত হবার পর মদীনার ইহুদীদের একটি অংশ খায়বারে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু খায়বার যা কি-না প্রথম থেকেই বৃহৎ সমরশক্তিসম্পন্ন ছিল, তা এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই খায়বারের ইহুদীরাই, যারা একটি বড়ো প্রতিনিধিদল নিয়ে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে মক্কায় যায়, যাদের মধ্যে খায়বারের বড়ো বড়ো ইহুদী নেতারাও ছিল, আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র করে আর তাদেরকে দলে ভেড়ানোর পর আশপাশের বিভিন্ন গোত্রে তাদের প্রতিনিধিদল যায়। আর একটি বিশাল দল গঠন করে তখনকার ইতিহাস অনুযায়ী পনেরো হাজার সেনাদল নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করে বসে, যা ইসলামের ইতিহাসে আহযাবের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ নামে সুপরিচিত; পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, যদি ইসলাম ধর্মের সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন না থাকত তাহলে মুসলমানদের পাশাপাশি সম্ভবত মদীনার নাম-গন্ধও বিলীন হয়ে যেত। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, খায়বারের ইহুদীরাই এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ছিল, যারা এখন সর্বদা মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল।

মদীনায় বসবাসকারী বনু কুরাইযাকে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে প্রথমবারে প্রদত্ত চরম শাস্তিও খায়বারের ইহুদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রে পরিবর্তন সৃষ্টির কারণ হতে পারে নি। এজন্য এটি অতি আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই চুক্তিভঙ্গকারী ও ষড়যন্ত্রকারী জাতির বিরুদ্ধে যেন সরাসরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ স্থানে শান্তিতে ও নির্ভয়ে নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করতে পারে, যেভাবে (বলা হয়েছে), يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ অর্থাৎ ধর্ম কেবল আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে নিবেদিত হোক। ধর্মে যেন কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ না থাকে, কেননা এটি আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার বিষয়।

একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারি ওয়াট, যিনি ইসলাম ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তিনি নিজেও তার পুস্তকে একথা লেখেন যার অনুবাদ হলো: **খায়বারে আক্রমণের সরল ও স্পষ্ট কারণ হলো, তারা তাদের সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে [অর্থাৎ খায়বারবাসীরা অঢেল (সম্পদ) ব্যবহার করে] নিজেদের প্রতিবেশী আরবদেরকে প্ররোচিত করেছিল, যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।**

তাই এটি ছিল সেই বিশেষ প্রেক্ষাপট যার কারণে মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশ অনুসারে খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ লেখেন, খায়বারের যুদ্ধ সপ্তম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (মাসে) সংঘটিত হয়। ইবনে উকবা ও আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে, মহানবী (সা.) যিলহজ্জ মাসে হুদাইবিয়া থেকে মদীনায় ফেরত আসেন এবং তিনি (সা.) মদীনায় প্রায় বিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন আর এটি মহররম মাস ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের যে নোট লিখেছেন তাতে তিনি (রা.) খায়বারের এই যুদ্ধকে সপ্তম হিজরীর মহররম ও সফর মাসের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়া থেকে ফেরত আসার প্রায় পাঁচ মাস পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইহুদীদের যারা মদীনা থেকে মাত্র কয়েক মঞ্জিল দূরে ছিল আর যেখান থেকে মদীনার বিরুদ্ধে সহজেই ষড়যন্ত্র করা যেত– (সেখান থেকে) বিতাড়িত করা হবে। অতএব, তিনি (সা.) ১৬০০জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক, হুদাইবিয়ার সন্ধির পাঁচ মাস পর এর তারিখ বর্ণনা করেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও দীবাচাহ্ তাফসীরুল কুরআনে একথাই বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং হাদীস বিশারদগণ হুদাইবিয়া সন্ধির অল্প কিছুদিন পরই মহররম মাসে এটি (তথা খায়বার যাত্রা) হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এসম্পর্কে এটিই লিখেছেন। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি নিঃসন্দেহে এক মহাবিজয় ছিল। পবিত্র কুরআন একে এক মহাবিজয় বলে অভিহিত করেছে। যেমনটি বলেছে, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আর এটি সুস্পষ্ট বিজয়ের সেই দরজা ছিল, যেটি অতিক্রম করে খায়বার ও মক্কা-বিজয়ের ন্যায় সুমহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা (তখনই) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে ফেরত আসার

সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় (আল্লাহ্ তা'লা) খায়বারের বিজয়ের সুসংবাদ এভাবে দিয়েছেন:

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا *
وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ

(সূরা আল-ফাতহ: ১৯-২১)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি তখন পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হন, যখন তারা গাছের নীচে তোমার (হাতে) বয়আত করছিল এবং তিনি তাদের হৃদয়ের ঈমানের বিষয়ে সবিশেষ অবগত হন। এর ফলে তিনি তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে এক আসন্ন বিজয়ের (সুসংবাদ) দান করেন; (অর্থাৎ খায়বারের বিজয়।) আর অনেক গনিমতের সম্পদ দান করেন (অর্থাৎ খায়বারের সম্পদ যা তারা পেয়েছিল) যা তারা সংগ্রহ করছিল আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে (আরো) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। এরপর তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে দান করেছেন।

সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এবং মদীনায় একজন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) যখন খায়বার অভিমুখে যাবার জন্য ঘোষণা প্রদান করান, তখন তিনি ঘোষণা করান, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কেবল তারাই (তাঁর) সাথে যাবেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) বলেন, যারা গনিমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে, তারা যেন আমার সাথে যাত্রা না করে। আমার সাথে কেবল তারাই যাত্রা করবে যারা জিহাদের আগ্রহ রাখে। ইবনে হিশামের মতে, হযরত নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্ লাইসি (রা.)-কে মহানবী (সা.) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে ইমাম বুখারীর মতে, তিনি (সা.) হযরত সিবাহ্ বিন উরফাতা (রা.)-কে নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায় খায়বারের যুদ্ধে; এর পূর্বে কেবল ছোটো ছোটো নিশান (বা ঝাণ্ডা) ব্যবহৃত হতো। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত হুবাব বিন মুনযের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) প্রমুখের হাতে পতাকা তুলে দেন। মহানবী (সা.)-এর পতাকাটি ছিল কালো রঙের, যা হযরত আয়েশা (রা.)-র চাদর দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর নাম ছিল **'উকাব'** আর এই পতাকাটি হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)-র কাছে ছিল। রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.)-কেও একটি পতাকা দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পতাকা খায়বারে দেওয়া হয়েছিল কারণ হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে রওয়ানা হতে পারেন নি, কেননা তিনি (রা.) চোখের পীড়ায় ভুগছিলেন ফলে তিনি (স্পষ্টভাবে) কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তবে পরে তিনি (রা.) অস্থির হয়ে রওয়ানা হন এবং খায়বারে গিয়ে পৌঁছেন। [তিনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি।] এই অভিযানে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর (সা.) সফরসঙ্গী ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয়-সাতজন মহিলা সাহাবী এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং আরেক রেওয়ায়েত মোতাবেক বিশজন মহিলা সাহাবী এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

হযরত উম্মে সিনান আসলামিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন খায়বারের যুদ্ধের সংকল্প করেন, তখন আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যদি অনুমতি দেন তাহলে আমিও সাথে যেতে চাই। আমি (পানির) মশকগুলো

পরিষ্কার করব এবং সৈন্যদের সরঞ্জামের সুরক্ষা নিশ্চিত করব আর কেউ অসুস্থ বা আহত হলে আমি তার চিকিৎসা করব। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। একইভাবে বনু গিফারের কয়েকজন নারী মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই, আমরা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করব এবং আমাদের সাধ্যানুযায়ী সৈন্যদের সাহায্য করব। মহানবী (সা.) তাদেরকেও অনুমতি প্রদান করেন আর তাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। মহানবী (সা.) এবং তাঁর (সা.) সাহাবীদের এই প্রস্তুতির কথা যখন মদীনার ইহুদীরা অবহিত হয়, তখন তারা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা অনুধাবন করে, যদি তিনি (সা.) খায়বারে প্রবেশ করেন তাহলে খায়বার ধ্বংস হয়ে যাবে যেভাবে বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরায়যা ধ্বংস হয়েছিল। মদীনার ইহুদীরা যথেষ্ট সম্পদশালী ছিল এবং মদীনার মুসলমানরা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাদের কাছ থেকে ঋণ নিত। তখন খায়বারের ইহুদীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত করা ও যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য দ্রুত নিজেদের দেওয়া ঋণ ফেরত চাইতে আরম্ভ করে। একজন সাহাবীর ঘটনা পাওয়া যায়, হযরত ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আবু শাহম নামক এক ইহুদীর কাছ থেকে ৫ দিরহাম এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৪ দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। (সেই) ইহুদী ঋণের অর্থ ফেরত চাইলে ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) তাকে বলেন, আমাকে কিছু সময় দাও, আমি খায়বার থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ্‌ তোমার প্রাপ্য অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দেবো, কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর রসূল (সা.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, খায়বার তাদেরকে গনিমত প্রদান করবে। আবু শাহম নামক সেই ইহুদী হিংসা ও শত্রুতার বশে বলে, তুমি কি মনে করো খায়বারবাসীদের সাথে লড়াই করা আমাদের মতো সাধারণ বেদুইনদের সাথে লড়াই করার মতো সহজ? তওরাতের কসম! সেখানে দশ হাজার দক্ষ যোদ্ধা রয়েছে। এই দুইজন নিজেদের এই বিচার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়। তখন যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা বিরাজ করছিল। এই ইহুদী চরম বিদ্বেষে খায়বারের ইহুদীদের সমর্থন এবং (তাদের প্রতি) সহমর্মিতা প্রদর্শন করছিল আর মুসলমান সেনাদলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপও করছিল। মহানবী (সা.) রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন; সেই ইহুদী কোনো শাস্তিও পেতে পারত। কিন্তু পরম ধৈর্য, সংযম, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতার এই আদর্শ দেখা যায় যে, মহানবী (সা.) বলেন, এই ইহুদীকে তার প্রাপ্য প্রদান করো। ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ আবির্ভূত করেছেন! এই মুহূর্তে তার প্রাপ্য পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নাই। তিনি (সা.) বলেন, যেভাবেই পারো তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দাও। ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার মাথার পাগড়ি খুলে সেটিকে লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করি আর পরনের যে চাদরটা লুঙ্গি হিসেবে পরতাম, সেটা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেই আর আমি অন্য কাপড় পরিধান করি। এই অন্য কাপড়টি ছিল একটি চাদর, যেটি সালমা বিন আসলাম, আবার আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে একজন বৃদ্ধা সাহাবী তাকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই বৃদ্ধা সাহাবী পুরো বিষয়টি জানার পর উপহারস্বরূপ এটি তাকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'লার বিধান দেখুন! খায়বারে সেই সাহাবী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করেন যার মাঝে একজন ইহুদী নারীও ছিল, যে সম্পর্কের দিক দিয়ে সেই আবু শাহম নামক ইহুদীর আত্মীয়া ছিল। এরপর তিনি পরবর্তীতে সেই ইহুদীর কাছেই সেই নারীকে বিক্রি করেন।

খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হবার সংবাদ পেয়ে মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে কেবলমাত্র ঈর্ষা, শত্রুতা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং আশজাআ' গোত্রের একজন বেদুইনকে ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতির ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ খায়বারের ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করে; সাথে আরো বলে পাঠায়, তারা যেন নির্ভয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এমনিতেও মুসলমানদের বিরোধীদের কোনো গুপ্তচরের প্রয়োজন ছিল না, কেননা মদীনায় বসবাসকারী মুনাফিকরা বেশ তৎপরতার সাথেই এই কাজ করত। যেমন, এই ঘটনার সময়ও মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল নীরব থাকে নি, বরং নিজের এক সহযোগীর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ একটি পত্র খায়বারের ইহুদীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল, মহানবী (সা.) তোমাদের দিকে আসতে যাচ্ছেন। নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করো এবং নিজেদের ধনসম্পদ নিজেদের দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে রাখো আর নিজেরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও এবং তাঁকে দেখে একেবারেই ভীতত্রস্ত হবে না। তোমাদের সংখ্যা অনেক বেশি আর মুহাম্মদ (সা.)-এর লোকবল অনেক কম আর তাদের কাছে সামান্য কিছু অস্ত্র আছে।

এই বিষয়ে যখন ইহুদীরা জানতে পারে, তখন তাদের নেতাদের একটি সভা হয় এবং সেই সভায় মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবরণটি এমন যে, খায়বারের ইহুদীরা যখন মুসলমান সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পায় তখন তারা একটি সভা করে যাতে ইসলামী সেনাবাহিনীর মোকাবিলার ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়। এই বৈঠকে ইহুদীদের নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একটি দলের অভিমত ছিল, ইহুদীরা যেন দুর্গে আবদ্ধ হয়ে প্রাচীরের পেছনে থেকে যুদ্ধ করে, যেন মুসলমানরা পরিশেষে নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নেয়। অপরদিকে খায়বারের বিখ্যাত বীর মারহাবের ভাই আবু যায়নাব প্রস্তাব দেয়, দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মোকাবিলার পরিবর্তে বাহিরে ময়দানে গিয়ে মোকাবিলা করা হোক। কেননা ইতিপূর্বে মদীনার ইহুদীরা দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাতে মুসলমানদেরই বিজয় হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী দলটি তার এই প্রস্তাবকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমাদের দুর্গগুলো তাদের দুর্গসমূহ থেকে অনেক মজবুত। তৃতীয় একটি প্রস্তাব এর চেয়েও ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল, যা ইহুদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দাম্ভিকতাপূর্ণ ছিল। আর সেটি খায়বারের সেনাদলগুলোর সেনাপতি সালাম বিন মিশকামের পক্ষ থেকে ছিল। তার বক্তব্য ছিল, আমরা স্বয়ং গিয়ে মদীনা আক্রমণ করি এবং নিজেদের সকল সঙ্গীদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করে দেই। অধিকাংশ লোক এই মতামতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। কিন্তু খায়বারের প্রধান নেতা কিনানা বিন আবিল হুকায়েক এর বিরোধিতা করে আর বলে, আমাদের দুর্গসমূহ মদীনার দুর্গগুলোর মতো নয়; আর তার অহংকার ও দম্ভের এই অবস্থা ছিল যে, সে বলতে থাকে, মুহাম্মদ (সা.) কখনোই আমাদের দিকে আসার সাহস করবে না। তবে সকল নীতিনির্ধারক এই বিষয়ে একমত হয় যে, একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করে আশেপাশের যুদ্ধবাজ সাহসী গোত্রগুলোর দিকে প্রেরণ করা হোক, যেন তাদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য চাওয়া যায়। অতএব চৌদ্দ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করা হয়, যার নেতৃত্বে কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে খায়বারের শীর্ষ নেতা কিনানা স্বয়ং ছিল। এই প্রতিনিধিদল বনু আসাদ, গাতাফান এবং অন্যান্য গোত্রের কাছে যায় এবং খায়বারের এক বছরের উৎপাদনের অর্ধেক দেবার বিনিময়ে সামরিক সাহায্য কামনা করে। বনু মুররা গোত্র দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে এভাবে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে বনু আসাদ ও বনু গাতাফানের ন্যায় যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো এক হাজার সশস্ত্র

সেনা সংবলিত সৈন্যদল তাৎক্ষণিকভাবে পাঠিয়ে দেয় এবং আরো চার হাজার সৈন্য সাহায্য হিসাবে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এর প্রস্তুতি গ্রহণও আরম্ভ করে।

যাহোক, এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মন্ডি বাহাউদ্দিনের মুকাররম মুহাম্মদ বখশ সাহেবের পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবের, যিনি সম্প্রতি ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার তিন কন্যা ও ছয় পুত্র রয়েছে। তার এক পুত্র কাশেফ জাভেদ সাহেব বর্তমানে সেনেগালে রয়েছেন এবং ভারপ্রাপ্ত মিশনারী ইনচার্জ ও জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এজন্য নিজ পিতার জানাযায় সেনেগাল থেকে এসে যোগদান করতে পারেন নি। তার এই পুত্র যিনি মুরব্বী, তিনি লিখেছেন, খাকসারের পিতা একান্ত সহজ-সরল, পুণ্যবান, খোদাভীরু ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহমদীয়াত ও খিলাফতের প্রতি তার পরম ভালোবাসা ছিল। নিজের পরিবারে তিনি একমাত্র আহমদী ছিলেন আর অধিকাংশ সময় এটিই বলতেন, আমরা যা কিছু পেয়েছি তা আহমদীয়াতের কল্যাণেই পেয়েছি। নিজের সন্তানদেরও সর্বদা আহমদীয়াত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, তার দাদা মুহাম্মদ আযম সাহেব ১৯৬৮ সালের কাছাকাছি সময়ে সারগোধার একটি গ্রাম রয়েছে ভাবড়া, সেখান থেকে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, সে সময় আমার পিতাও আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, মায়ের দিক থেকে তিনি একমাত্র ভাই ছিলেন। আহমদী হবার পর ম্যাট্রিক শেষে গ্রাম ছেড়ে মন্ডি বাহাউদ্দিনে শাহ তাজ সুগার মিলে চাকরি গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত মন্ডি বাহাউদ্দিনেই বসবাস করেন। বড়ো বয়সে নিজ উৎসাহে কুরআন পড়া শেখেন আর এতটাই পরিশ্রম ও ভালোবাসার সাথে পড়েন যে, প্রত্যেক মাসে এক বা দুইবার অবশ্যই কুরআন খতম করতেন; রমযান মাসে দুই তিনবার খতম করতেন। দরিদ্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। যে-ই তার কাছে আসত তাকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতেন না। মুরব্বী সাহেব বলেন, তিনি আমাকেও বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর যে অনুগ্রহই করছেন তা তোমার ওয়াক্ফের কল্যাণে করছেন।

তার এক পুত্র মোবাশ্বের জাভেদ সাহেব বলেন, গত কয়েক বছর যাবৎ আমি সেক্রেটারি মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার বাবা সর্বদা চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিত ছিলেন। আর যখনই তিনি পেনশন পেতেন তখন সবসময় এই প্রচেষ্টাই থাকত, পুরো বছরের চাঁদা একসাথে আদায় করে দেবেন। আর মৃত্যুশয্যাতেও তার এ চিন্তাই ছিল যে, আমার চাঁদা পরিশোধ হয়েছে কিনা। মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তিনি এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আমার সমস্ত চাঁদা প্রদানের তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং (পরিবারের) সবাইকে ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কেনিয়ার নায়েব আমীর-২ হাবীব মোহাম্মদ শাতরী সাহেবের, যিনি মোহাম্মদ হাবীব শাতরী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা-মাতা ছাড়া স্ত্রী এবং তিন সন্তান রয়েছে। কেনিয়া জামা'তের আমীর মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, তার পূর্বপুরুষরা ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন আর তার পিতা হাবীব শাতরী সাহেব ১৯৮২ সনের আগস্টে বয়আত গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত

নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আর মরহুম তার বড়ো পুত্র ছিলেন। পিতার বয়আত করার কিছুদিন পর তিনিও বয়আত গ্রহণ করেন আর আমৃত্যু বয়আতের অঙ্গীকার খুব ভালোভাবে পালন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মুমবাসায় গ্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের পক্ষ থেকে কিছু সময়ের জন্য তাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ফ্রান্সেও প্রেরণ করা হয়। খলীফাদের সাথে নিজের সাক্ষাতের ঘটনাবলিকে সর্বদা নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলি হিসেবে বর্ণনা করতেন। চতুর্থ খলীফার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন আর আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি কেনিয়া জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারি তালীম ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি বলেন, তার সাথে আমার বিশ বছর যাবৎ পরিচয়। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং যে কাজই তাকে দেওয়া হতো তা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন; কখনো স্মরণ করানোর প্রয়োজন হয় নি। নিয়মিত নামায আদায়কারী, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলি ও নির্ধারিত সীমাসমূহের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল, চাঁদা প্রদানে নিয়মিত, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, পিতামাতার আনুগত্যশীল এবং তাদের অধিকার প্রদানকারী, ছোটো ভাইবোনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী, বিজ্ঞ, পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। বড়ো বড়ো কোম্পানিতে উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছিলেন। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং সরকারী ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে তার ওঠাবসা ছিল, কিন্তু কখনো নিজের আহমদী হবার বিষয়টি গোপন করেন নি, বরং তা উপস্থাপন করে তবলীগও করতেন। আর এ কারণেই তার জানাযায় মুমবাসার বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, ব্যাবসায়ী, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যক্তিত্ব অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার সকল আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো মুকাররম আনুবী মাদিংগু সাহেবের, যিনি জিম্বাবুয়ের একটি স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র জিম্বাবুয়ে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ইউসুফ আনুবী সাহেব লেখেন, প্রথম দিকে তিনি সুন্নী মুসলমান ছিলেন আর জামা'তের বিরোধিতা করতেন, কিন্তু তার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ছিলো। প্রথমে তিনি মালাভিতে ছিলেন। সেখানে যখন থাকতেন তখন তার অনেক বিরোধিতা ছিল, পরবর্তীতে জিম্বাবুয়েতে স্থানান্তরিত হন। এখানে এসে ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসার কারণে তিনি তার আশপাশের লোকদেরকে একত্রিত করেন আর যে অঞ্চলে বসবাস করতেন সেখানে বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা করেন। তার হৃদয়ে এক উৎকণ্ঠা ছিল যে, আমি একজন প্রকৃত মুসলমান হব। যাহোক, পরবর্তীতে জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ হয়। সেখানে আমাদের মুরব্বী সাহেব আছেন সামিউল্লাহ্ সাহেব, তার সাথে দীর্ঘ ধর্মীয় আলোচনা হতে থাকে এবং অবশেষে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর সেই এলাকায় তিনিই ছিলেন প্রথম আহমদী। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার অনেক বিরোধিতাও হয়। আর যে লোকদের তিনি একত্রিত করেছিলেন তারাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারা তার সাথে কঠোরতাও করেছে। এরপর তিনি সেখানে নামাযের জন্য যে সেন্টার তৈরি করেছিলেন তা ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে নামায এবং জুমুআ পড়তে আরম্ভ করেন। যাহোক, তিনি মনোবল হারান নি; তবলীগ করতে থাকেন আর অনেক মানুষ

তার কথা শোনেন, জামা'তের বার্তা শোনেন আর তার মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। অনেক মানুষ তার আদর্শ দেখে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিজে আর্থিক কুরবানী করে তিনি জমিও ক্রয় করেছেন, যেখানে বর্তমানে জিম্বাবুয়ে আহমদীয়া জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। তার ইচ্ছে এটাই ছিল যেন তার জীবদ্দশায় মসজিদ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু যাহোক, তার জীবদ্দশায় নির্মাণ সম্ভব হয় নি, এখন হচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, স্পষ্টভাষী এবং সৎ মানুষ ছিলেন। মানুষের পারস্পরিক সমস্যাদি গভীর প্রজ্ঞার সাথে সমাধা করতেন। জামা'তের প্রেসিডেন্ট হবার পূর্বেও অধিকাংশ মানুষ তার প্রতি গভীর আস্থা ও ভরসা রাখতেন। তিনিও ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। সবসময় তার বাড়ি অতিথিতে সরগরম থাকত। জামা'তের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সবাইকে জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখার উপদেশ দিতেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে আট সন্তান রয়েছে। আর তার ছেলে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, জিম্বাবুয়ে জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। তার এক পৌত্র কাসেম আনুবী জামেয়া থেকে পড়াশোনা করা জিম্বাবুয়ের প্রথম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ (হিসেবে কর্মরত আছেন)।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার বংশধরদের মাঝে জামা'তের শিক্ষা সর্বদা অব্যাহত থাকুক আর তারা পুণ্যকর্ম করতে থাকুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)